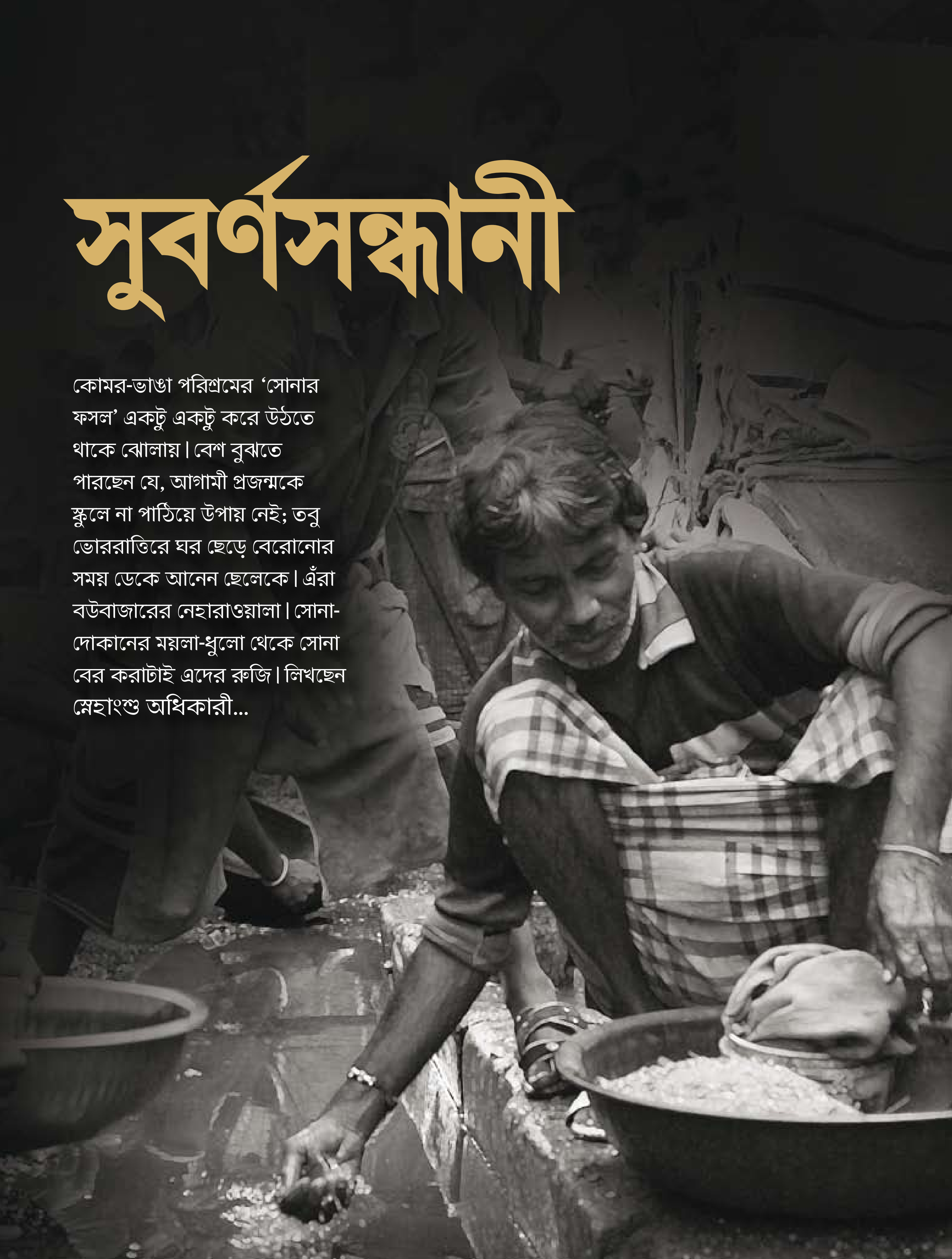

সুবর্ণসন্ধানী

কোমর-ভাঙা পরিশ্রমের ‘সোনার ফসল’ একটু একটু করে উঠতে থাকে ঝোলায়। বেশ বুঝতে পারছেন যে, আগামী প্রজন্মকে স্কুলে না পাঠিয়ে উপায় নেই; তবু ভোররাত্তিরে ঘর ছেড়ে বেরোনোর সময় ডেকে আনেন ছেলেকে। এঁরা বউবাজারের নেহারাওয়ালা। সোনা-দোকানের ময়লা-ধুলো থেকে সোনা বের করাটাই এদের রুজি। লিখছেন স্নেহাংশু অধিকারী...

ইমরান খান, মিসেস চৌধুরী ও বউবাজার ঃ
ডালহৌসি অফিসপাড়া থেকে বউবাজার হয়ে প্রথমে পায়ে হেঁটে শিয়ালদা। তারপর সেখান থেকে ছ'টা পাঁচিশের নৈহাটি লোকাল ধরে সোজা বাড়ি। গত প্রায় পনেরো বছর ধরে মোটামুটি এরকম রুটিনেই অভ্যস্থ মিসেস চৌধুরী। সাড়ে পাঁচটায় অফিস ছুটির পর অফিসের বাকি স্টাফরা যখন বাড়ি ফেরার তাড়ায় বাস ধরতে ব্যস্ত, মিসেস চৌধুরীর চোখে-মুখে তখন অদ্ভুত একটা দীপ্তি। সারাদিন অফিসের টেবিলে ধুলোভরা ফাইল ঘাঁটার ক্লান্তিও যেন নিমেষে উধাও। কেমন যেন নেশার মতো তাঁকে টানতে থাকে বউবাজার। ভূতে পাওয়ার মতো তিনি হাঁটতেই থাকেন। হাঁটতে হাঁটতে পেরিয়ে যান একের পর এক - বসাক জুয়েলার্সের ঝাঁ-চকচকে নেকলেস, লক্ষ্মীনারায়ণ জুয়েলার্সের কানের দুল, বঙ্গলক্ষ্মী জুয়েলার্সের হাতের বালা, ছোট্ট একখণ্ড হীরে বসানো নাকছবি। রোজ দেখেন, তবু যেন পুরানো হয় না। এমনকি বাড়ি ফিরে এসে ঘুমের মধ্যেও হাতছানি দিয়ে তাঁকে ডাকতে থাকে বউবাজারের সোনালি নেশা।

ঘুম আসে না ইমরান খানেরও। সোনার নেশাটাই আসলে এমন। আবার এই নেশাটাই কখন যে তার পেশা হয়ে গেছে, তা আজ আর কিছুতেই ঠাহর করতে পারে না ইমরান। মাত্র সাত বছর বয়সে একদিন বাবার হাত ধরে আগ্রা থেকে ট্রেনে চেপে বসেছিল সে। তখনও ভাবেনি যে, বাপ-ঠাকুরদার মতো তাকেও থেকে যেতে হবে এই কলকাতাতেই। ভালোবাসতে হবে বউবাজারের এই সোনা দোকানের এঁদো গলিগুলোকে। কিন্তু সেটাই হয়ে গেল নিয়তি। মিসেস চৌধুরীর মতোই বউবাজারের মোহ আজ আর কিছুতেই এড়াতে পারে না সে। সোনা দোকানের ধুলো, ফেলে দেওয়া আবর্জনার মধ্যে থেকে তিল তিল করে সোনার গুঁড়ো বের করাটাই এদের পেশা। এদের স্থানীয় নাম 'নেহারাওয়ালা'। 'কড়াইওয়ালা'-ও অবশ্য বলেন কেউ কেউ। টিকিয়াপাড়া থেকে রোজ ভোর রাতের ট্রেন ধরে হাওড়া। তারপর সেখান থেকে সোজা বউবাজার। মাঝখানে ছোট্ট একটা পনেরো মিনিটের ব্রেক। কলেজ স্ট্রিট-এর কাছেই মেছুয়া। মেছুয়া বাজারের ভেতরেই আট ফুট বাই দশ ফুটের একটা রুম। সেখানেই কোনওরকমে গাদাগাদি করে থাকে মহম্মদ জব্বার, রাজা, মুজিবর মালিক, শোয়েব নুর ...... মোট ছ'জন। রক্তের সম্পর্ক কিছু নেই, তবু কত মিল এই ছ'জনের সঙ্গে। মেছুয়ার ভাড়া ঘরে ততক্ষণে তৈরি হয়ে গেছে ফ্যান-ভাত, আলুসেদ্ধ। রাত্রে বাসি চপও রয়ে গেছে গোটা চারেক। ছয় আর একে সাতজন মিলে, সেটাই গোগ্রাসে গিলে সোজা বউবাজার।

উড়াইয়া দ্যাখো তাই!! পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন ঃ
প্রত্যেকেরই পিঠের ঝোলায় কড়াই, ঝাড়ু, ছাঁকনি, চালুনি। আরও যে কত কী, ভগবান জানেন! দিনের আলো সবে ফুটেছে হয়ত। সেই আলোতেই শুরু হয়ে গেছে কাজ। বাসরাস্তার ঠিক পাশেই ফুটপাথ ঘেঁষে সোনার দোকানগুলোর ঠিক সামনে লম্বালম্বি চলে যাওয়া একটা ড্রেন। ড্রেনের ভাগাভাগিও করা আছে যথারীতি। আস্তে আস্তে ঝাড়ু দিয়ে দোকানের ধুলো এনে ফেলা হয় ওই ড্রেনে। দেখতে দেখতেই কালো হয়ে ওঠে ড্রেনের জল। অভ্যস্থ হাতে চলতে থাকে চালুনি। কোমর-ভাঙা পরিশ্রমের 'সোনার ফসল' একটু একটু করে উঠতে থাকে ঝোলায়। সত্যিই কী সোনা জোটে কপালে? জোটে তো বটেই, নাহলে কীসের আশায় কেবল এই বউবাজার সোনাপট্টিতেই রোজ প্রায় শ' তিনেক মানুষ ভোর হতে না হতেই হামলে পড়ে! আপাতভাবে রাস্তার পাশ থেকে যারা ময়লা-প্লাস্টিক কুড়িয়ে নিয়ে যায়, তাদের সাথে এদের কোনও পার্থক্য নেই। কিন্তু ফারাকটা আসলে রোজগারে। কাজ করতে করতেই কথা বলছিল আব্দুল জব্বার। বাবারটা ধরলে, এই পেশার সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্ক প্রায় সত্তর বছরের। চোদ্দ বছরের ছেলেটাকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসছে মাস চারেক। কথা বলছিল বটে, কিন্তু চোখগুলো যথারীতি চিকচিক করছিল, চোরাবালির চালুনিতে! পলক ফেলার উপায় নেই যে! অবিকল যেন জহুরীর চোখ। মোটামুটিভাবে বারো মাসই এরা সোনা খোঁজার কাজে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু কারবারের রমরমা মূলত অক্টোবর

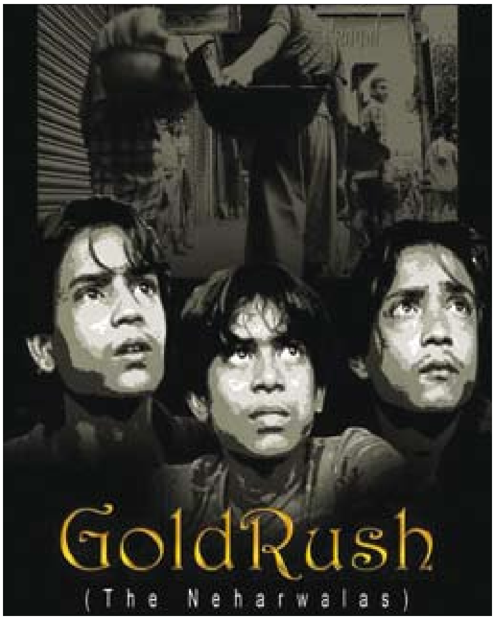

কোমর-ভাঙা পরিশ্রমের 'সোনার ফসল' একটু একটু করে উঠতে থাকে ঝোলায়।

থেকে মার্চ মাসের সময়টা। লক্ষ্মী, কালী, বিশ্বকর্মা ইত্যাদি পুজো এবং অবশ্যই বিয়ের সিজিন। কারবার বলতে, প্রাথমিকভাবে আবর্জনা থেকে যতটা সম্ভব পরিশ্রুত অবস্থায় সোনার গুঁড়ো তুলে নিয়ে যাওয়ার পর তা সরাসরি চলে যায় হাওড়ায়। সেখানেই পরিশোধনের মূল কাজটা হয়। পদ্ধতিটা অবশ্যই ষোড়শ শতকের মুঘল দরবারের অ্যালকেমিস্ট রেওয়াজেই। সেই একইভাবে অ্যাসিড ও পারদ দিয়ে পরিশোধন। সারাদিনের খাটনি শেষে লাভ কতটা থাকে এর উত্তর দিতে গিয়ে জব্বার জানাল — "মন্দা চলছে বাবু। কেউ ছাড় পেল না। আগে আগে ডেলি ৩০০-৪০০ টাকা চুটকিতে উঠে আসত। এখন তো দিনের শেষে একশো টাকা রোজগার করতেই জান কয়লা হয়ে যায়।" চকচক করলেই যে তা সোনা হয় না, এই সত্যিটা খুব ভালো করেই জানে জব্বাররা। তাই কাজটা শুনতে যতটা সহজ, বাস্তবে আদৌ তা নয়। চোখে ইদানিং তেমন ভালো দেখছেন না মুজিবর মালিক। চোখের আর কী দোষ! বয়সটা তো নেহাত কম হল না! কিন্তু তা বললে সংসারের আটটা পেট শুনবে কেন! খালি পেটে ঘুম আসতে চায় না, তাই ভোর রাতের কাঁচা ঘুমেই ডাক দেয় বউবাজার। যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে এই কাজটাই করে আসছেন তাঁরা, তাই স্বাভাবিকভাবেই সোনার দোকানের কর্মচারীদের সঙ্গে ভালো একটা সখ্যতাও গড়ে উঠেছে। দু'পক্ষই বস্তুত মুখিয়ে থাকে বিশ্বকর্মা পুজোর আগের দিনটার জন্য। এই দিনেই দোকানে সাফসাফাই হয়। বসার মাদুর থেকে শুরু করে, কাঠের জলচৌকি, কাজের ব্রাশ, চিমটে, সব আলাদা আলাদা করে পরিষ্কার করা হয় অত্যন্ত যত্নে ও সাবধানে। তারপর সেই পড়ে থাকা ধুলো-নোংরা নিয়ে শুরু হয় আবিষ্কারের নেশা। স্বর্ণকাররা এমনকি এই নেহারাওয়ালাদের জন্য সোনার জলও জমিয়ে রাখেন। কিচ্ছুটি ফেলেন না। তাই আমদানির কিছুটা বখরা তো দিতেই হয় স্বর্ণকারদের।

রাজার গপ্পো!!

ডকুমেন্টারি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কলকাতার রাজা দে খুব বেশি দিনের নন। অথচ এই অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর মুকুটে জুড়ে গেছে একটার পর একটা সুবর্ণ পালক। ২০০৮ সালের ডকুমেন্টারি বিভাগে মনোনয়নপ্রাপ্ত টিম স্টার্নবার্গ পরিচালিত 'সালিম বাবা' ছবিতে তিনি ছিলেন সিনেমাটোগ্রাফারের ভূমিকায়। তারপর গত অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইটালিতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সেডিকোরটো ফিল্ম ফেস্টিভেলের দ্বিতীয় দিনেই দেখানো হল তাঁর সাম্প্রতিকতম চোদ্দ মিনিটের ডকু-ফিল্ম - 'গোল্ড রাশ ঃ দ্য নেহারাওয়ালাস'। স্পেশাল জুরি মেনশন অ্যাওয়ার্ডও ছিনিয়ে আনলেন সেখান থেকে। এর আগের তিনটি ছবি - 'দ্য ব্যান্ড পার্টি ঃ বাজাতে রহো', 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস গোস্বামী ঃ দ্য বহুরূপীজ' এবং শিশুকন্যা হত্যানির্ভর 'তামান্না'-তেও যথেষ্ট মুন্সিয়ানার ছাপ রেখেছিলেন তিনি। সেই রাজা দে-ই মুখোমুখি হলেন দসাই-এর...

'গোল্ড রাশ ঃ দ্য নেহারাওয়ালাস' করার কথা কি হঠাৎ করেই মাথায় এল?

একপ্রকার সেরকমই। কলকাতাতেই থাকি, অথচ এই নেহারাওয়ালাদের সম্পর্কে ২০০৫ সালের আগে পর্যন্ত প্রায় কিছুই জানতাম না। ফিল্ম স্কুলে যাতায়াতের পথে বউবাজারের অলিতে-গলিতে প্রায়ই চোখে পড়ত একদল ছেলেবুড়ো তন্নতন্ন করে নোংরা ঘাঁটছে, ঘেঁটেই চলেছে। কী যেন খুঁজছে! সে কি অখণ্ড মনোযোগ! প্রথমে ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারিনি। পরে জেনেছিলাম - আবর্জনার মধ্যে থেকে সোনা খুঁজে বেড়ানোটাই ওদের কাজ। তারপর থেকেই ছটফট করছিলাম, এদের জীবন নিয়ে একটা ছবি করতেই হবে!

২০০৫-এ চিন্তাভাবনা শুরু করলেন, ছবি শেষ হতে হতে ২০০৮ হয়ে গেল?

আসলে আমার কিছু করার ছিল না। ২০০৫-এ যে তিনটি ছেলেকে নিয়ে শ্যুটিং শুরু করেছিলাম হঠাৎ একদিন তিনজনই উধাও হয়ে গেল। কোথায় যে গেল, কোনও পাত্তা নেই! শুধু কলকাতাতেই তো নয়, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, গুজরাটেও এদের কারবার। এরকমই কোনও এক রাজ্যে চলে গিয়েছিল বোধহয়। ওদের না পেয়ে একটু দমেই যাই। তারপর ২০০৮-এ এসে আবার নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করি। পেয়ে যাই অন্য তিনজনকে। এরাও আগ্রার।

এর আগের ছবি 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস গোস্বামী ঃ দ্য বহুরূপীজ', 'দ্য ব্যান্ড পার্টি ঃ বাজাতে রহো'-তেও তো বিভিন্ন পেশার মানুষের কথাই বলেছিলেন! পেশা নিয়ে এই কারবার কি আপনার উদ্দেশ্য প্রণোদিত?

চারপাশটা দেখলেই বুঝতে পারবেন, দু'বেলার অন্ন সংস্থান করতে গিয়ে মানুষ কী না করছে! খুন-ডাকাতি-চুরি-ছিনতাই যেমন আছে, তেমনি আছেন মিস্টার অ্যান্ড মিসেস গোস্বামীর মতো বহুরূপী গোষ্ঠী অথবা ইমরান খান অথবা ইয়াসিন আনোয়ার হোসেনের মতো নেহারাওয়ালারাও। পেটের তাগিদে মানুষের এই কঠোর পরিশ্রমটাই আমাকে উদ্বুদ্ধ করে বরাবর। যত নোংরা ঘাঁটার কাজই হোক এরা তো কোনও অন্যায় করছে না! টিকে থাকার এই লড়াইটাই অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং আমার কাছে। পৃথিবীর জন্মের প্রথম দিন থেকে আমরাও তো এই টিকে থাকার লড়াইটাই চালিয়ে যাচ্ছি! তাই না?

ড্রেন থেকে কতটুকু আর সোনা জোটে এদের কপালে?

এটা সত্যিই একটা রহস্যের মতো। আবর্জনা থেকে পরিশোধনের পর পুনরায় সেই সোনা ব্যবহারযোগ্য করে তোলার পুরো প্রক্রিয়াটা অবশ্য আমি ছবির মধ্যে দেখাতে পারিনি; কিন্তু ওদের সঙ্গে কথা বলে যেটুকু বুঝেছি, কলকাতার বউবাজার, সিঁথির মোড়ের সোনা দোকানগুলোই ওদের জীবনের সবচেয়ে বড় ভরসার জায়গা। বংশ পরম্পরায় এই পেশার সঙ্গেই ওরা সবচেয়ে বেশি অভ্যস্থ ও সাবলীল। শেষে এটাই বলব, ছবিটা করে বেশ তৃপ্তি পেয়েছি। আশা করছি, দর্শকরাও এর মধ্যে থেকে সোনা খুঁজে পাবেন।

তবে সবাইকে দিয়ে-থুয়েও হাতে যা পড়ে থাকে, তা নেহাত কম নয়। কোনও কোনও দিন অবশ্য খালি হাতেও ফিরে আসতে হয় এঁদের। সোনার দাম যেভাবে দিনদিন আকাশ ছুঁতে শুরু করেছে, তারও একটা সরাসরি প্রভাব পড়েছে এদের উপরেও। লক্ষ্মীপুজো বা ধনতেরাস উপলক্ষ্যে সোনার অলঙ্কার কেনাটা যতই শুভ হোক, পকেটে টান পড়াতেই কলকাতার অনেকেই ঝুঁকছেন রূপো অথবা মুক্তোর দিকে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সোনার কাজও কমেছে বেশ ভালো হারে। তাই সারা সপ্তাহের প্রচণ্ড পরিশ্রমে 'সোনার ফসল' ফলে পাঁচশো মিলিগ্রাম বা তার চেয়ে সামান্য বেশি। অথচ আজ থেকে কয়েক বছর আগে পর্যন্তও কয়েক ঘন্টার পরিশ্রমেই উঠে আসত এক গ্রাম সোনা। মানে মাসের শেষে মোটামুটি হিসাবে প্রায় ৭,০০০ টাকা। তবু কথায় আছে না - আশায় বাঁচে চাষা! বউবাজারে নেহারাওয়ালাদের ছবিটাও ঠিক তাই। দম বা পলক ফেলার ফুরসত নেই কারোর। বেশ বুঝতে পারছেন যে, আগামী প্রজন্মকে স্কুলে না পাঠিয়ে উপায় নেই। তবু ভোররাত্তিরে ঘর ছেড়ে বেরোনোর সময় ডেকে আনেন ছেলেকে। ছেলেও ধুরন্ধর - সোনার একটা কনাও যেন ফাঁকি না দিতে পারে। নেশার থেকে কোনও অংশে কম নয় এই পেশা।

ক-এ কলকাতা, ক-এ ক্যালিফোর্নিয়া

আগুন অথবা আলোর দিকে যেভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে পোকা, ছবিটা যেন সেরকমই। এরকমই এক আলোর হদিশ আজ থেকে প্রায় ১৬০ বছর আগে ছেপেছিল ক্যালিফোর্নিয়ার নিউজপেপার — "গোল্ড অন দ্য আমেরিকান রিভার"। ক্যালিফোর্নিয়া গোল্ডরাশ। প্রকৃতি বুক থেকে হঠাৎ খুঁজে পাওয়া সোনার টানেই বস্তুত সেদিন ঘরবাড়ি ছেড়েছিলেন হাজার হাজার মানুষ। ১৮৪৮ সালের ২৪ জানুয়ারির সকালে আকস্মিকই ক্যালিফোর্নিয়ার কলোমায় কয়েকখণ্ড সোনার সন্ধান পান জেমস উইলসন মার্শাল। দাবানলের গতিতে ছড়াতে থাকে সংবাদ। স্থানীয়রা তো বটেই, এমনকি আমেরিকা, ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া থেকেও স্থলপথ অথবা জলপথ হয়ে আসতে শুরু করেন 'ফর্টিনাইনার্স'-রা (১৮৪৯ সালের কথা মাথায় রেখে এদের এই নামেই সম্বোধন করা হয়)। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৮৪৮ থেকে ১৮৫৫ সালের মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়ায় সোনার সন্ধানে এসেছিলেন প্রায় ৩,০০০০০ মানুষ। প্রথমদিকে মূলত প্যানিং পদ্ধতিতেই পাহাড়ি ঝর্ণার থেকে সোনা আহরনের কাজ হত, পরে অবশ্য আধুনিক প্রযুক্তি এসে পড়ে ক্যালিফোর্নিয়ায়। ততদিনে গোটা ক্যালিফোর্নিয়ারই ভোল পাল্টে গেছে। একদিন যা ছিল ছোট্ট ভূখণ্ড মাত্র, সেই সান ফ্রানসিসকো গোল্ড রাশ-কে অবলম্বন করেই হয়ে গেল বুম-টাউন। সোনার নেশায় মাতাল হয়ে যাঁরা গিয়ে পড়েছিলেন সেখানে, তাঁদের মধ্যে অনেককে অবশ্য খালি হাতেই ফিরিয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া। প্রকৃতির মর্জি বোঝা সত্যিই ভার।

সুবর্ণরেখার চর বেয়ে

বরং ঝাড়খণ্ডের সুবর্ণরেখা নদী আজও সমান উদার। নদীর পাড়ে জমে থাকা বালির সোনালি আভা আজও চোখ ঝলসে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। মানুষের বিশ্বাস শুধু নয়, সুবর্ণরেখার জলে সোনার অস্তিত্ব আজ রীতিমত প্রমাণিত। বহু বছর ধরেই নদীর বালিতে মিশে থাকা সোনা সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছেন বহু স্থানীয় আদিবাসী। ঘাটশিলার নিকটস্থ আমইনাগর, মুসাবনি গ্রামের মূলত বিধবা বৃদ্ধারাই এই সোনা সংগ্রহের কাজটা করে থাকেন। সকাল থেকে শুরু করে সূর্য ডোবার আগে পর্যন্ত কাঠের পাত্র ও চালুনি নিয়ে চলতে থাকে সোনা ঝাড়াই-বাছাই-এর কাজ। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর সপ্তাহের শেষে জোটে আড়াইশো-তিনশো টাকার মতো। আয় কিছুটা কমেছে তো বটেই, কিন্তু তবু রোজ নেশার মতো সকাল হলেই নদীর পারে চলে আসেন এঁরা। একমাত্র এর উপরেই যে তাঁদের সংসার চলে, তা কিন্তু নয়। বরং পূর্ণিমা ধীবরের (৫৭) মতো অনেকেই ঘাটশিলা বাজারে সব্জি ব্যবসা করেন। তবু আসতেই হয় নদীর চরে। সোনালি নেশার ধরণই এমন। নিজেদের পেশাটাকে এরা লটারির টিকিট কাটার মতো করেই দেখেন। লাগলে তুক, না লাগলে তাক।

বউবাজারের জব্বার, মালিকদের কাছে জীবনটা অবশ্য এত সহজ নয়। প্রথমবার যখন এই নেহারাওয়ালাদের নিয়ে ছবি করার কথা ভেবেছিলেন

খালি পেটে ঘুম আসতে চায় না, তাই ভোর রাতের কাঁচা ঘুমেই ডাক দেয় বউবাজার।

রাজা দে (বক্স সাক্ষাৎকার দেখুন আগের পাতায়), এদের এই প্রবল মনোসংযোগ. দৃঢ় আত্মবিশ্বাসটাই তাঁকে নাড়িয়ে দিয়েছিল সবচেয়ে বেশি। ছবির প্রথমদিনের শ্যুটিং করার পর তিনি স্বাভাবিকভাবেই জানতে চেয়েছিলেন, টাকা পয়সা কিছু লাগবে কিনা উত্তরে ইমরান খান বলেছিলেন, "টাকা পয়সা চাই না। চা-বিস্কুটটা খাইয়ে দিলেই হবে। তবে বাবু একটা কথা ছিল, শ্যুটিংটা একটু জলদি জলদি করে নিলে হয় না? আমাদের কাজের যে বড় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে!"

সেদিন অবশ্য কাজ আর বেশি এগোয়নি কারোরই। সন্ধ্যে নেমে গেছে প্রায়। কম আলোয় ভালো কাজ হয় না এদের। অগত্যা ক্যামেরা, লাইট সব গুছিয়ে নিয়ে 'ডিরেক্টর' ফিরছিলেন বাড়ির পথে। আর ঝোলার মুখ আঁটোসাঁটো বন্ধ করে আট ফুট বাই দশ ফুটের মেসবাড়ির দিকে পড়িমরি করে ছুটছিলেন 'বউবাজারের হিরোরা'। কাল সকালেই ফেরৎ আসতে হবে কিনা! অতএব আজকের মতো এখানেই — কাট! দসাই